নারীবাদ সম্পর্কে আমার বোঝাপড়া

অরূপ ব্যানার্জী

স মা জ ভা ব না

মূল্য: ৫০ টাকা

.

উৎসর্গ

সমাজভাবনার আড্ডার সকল সদস্যকে

নারীবাদ শব্দটার সাথে আমার প্রথম পরিচয় ক্লাস সিক্সে থাকতে, আহমদ ছফার **পুষ্প বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ** বইতে। এই বইয়ের নামটা যতো খটমটে, বিষয়বস্তু মোটেই তেমন না। পত্রিকার একটি লেখায় উল্লেখ পেয়ে বইটা পড়ি, যারা ফুল পাখি গাছ ভালোবাসেন, বইটা তাদের ভালো লাগার কথা। সেই বইতে একটি চরিত্র ছিলো, বাবুল নামে। ছেলেটি বস্তিতে থাকে, আহমদ ছফা তাকে নিয়ে এসেছেন পড়ালেখা করানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু ছেলেটি অন্য ছেলেদের সাথে প্রায়ই মারপিট করে। তখন তার মাও এসে যোগ দেয় সেই কোন্দলে।

বাচ্চাটার নাম বাবুল। বড়জোর সাত বছর বয়স। তার মা প্রচন্ড নারীবাদী মহিলা। কম করে হলেও তিন মাসে একবার স্বামী পাল্টান। মহিলার শরীরের গাঁথুনি চমৎকার। চেহারায় আলগা একটা চমক আছে। ঠোঁট দুটো সবসময় পানের রসে ছোপানো।

সুতরাং, নারীবাদ সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ধারণা তৈরী হলো এই যে, নারীবাদী হলেন সেই মহিলা যিনি তিন মাসে একবার স্বামী পাল্টান! নারীবাদ সম্পর্কে আমার ধারণা হয়তো সেখানেই স্থির থাকতো, যদি না সময়ের সাথে সাথে আরো অনেক শ্রেষ্ঠ লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটতো! আহমদ ছফা এখানে এই রূপকটি ব্যবহার করেছেন ব্যাঙ্গাত্মক অর্থে, প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে **স্বামী পাল্টানো** নিশ্চয়ই একটি **নারীবাদী** কাজ!

নারীবাদ নিয়ে তারপর দীর্ঘদিন তেমন কিছু ভাবিনি। তখন আমি অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় এক স্বাপ্নিক কিশোর। ফেলুদা পড়ি, সেবা প্রকাশনীর তিন গোয়েন্দা পড়ি, জুল ভার্ন পড়ি আর কল্পনায় মস্ত সব এ্যাডভেঞ্চার করি। আমার বয়সী, আমার সহপাঠী মেয়েটার হয়তো ওই বয়সেই প্রথম পিরিয়ড হয়, আমার সমবয়সী হয়েও সে হয়তো আমার চেয়ে অনেক পরিণত হয়ে যায়। জীবনের রহস্য জেনে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়!

আমার সম্মুখে জীবনের রহস্য উদঘাটিত হয় কয়েক বছর পরে, সম্ভবত ক্লাস এইটের শেষের দিকে, এক বন্ধুর বাড়ির নিচতলায়, তার বাবার কম্পিউটারে! পরিচিত পৃথিবীটা দুলে ওঠে, সহজ ব্যাপারগুলো জটিল মনে হতে থাকে, জটিলকে দুর্বোধ্য! শরীরের মাঝে বিচিত্র হরমোনের খেলা মনকে অস্থির করে দেয়। সহপাঠী ছেলেরা অবশ্য কিছু আগেই ব্যাপারগুলো জানতো। প্রতিটা ক্লাসেই কিছু নেতাগোছের ছেলে থাকে, এই ব্যাপারে হাতেখড়ি দেয়ার দায়িত্বটি তারাই পালন করে, অনেক ভুল ধারণা নিয়ে গড়ে ওঠে আমাদের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি!

নারী পুরুষের সম্পর্কের মাঝে যে কিছু একটা রহস্য আছে তা অবশ্য আগে থেকেই অনুমান করতাম। বাড়িতে বেশ কিছু সংস্কৃত বই ছিলো, অনুবাদসহ। হাতের কাছে অন্য কিছু না পেয়ে আমি সেগুলোতে দাঁত বসাতে থাকি। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য পড়ে প্রথম বুঝেছিলাম জীবনে উত্তেজনা শুধু গোয়েন্দা গল্পের মাঝেই নেই, এর আরো উৎস আছে!

•

এরপর একদিন, ক্লাস নাইন। এক বন্ধু তার মায়ের সংগ্রহের একটি বই লুকিয়ে নিয়ে এলো। বইয়ের প্রচ্ছদে অর্ধনগ্ন নারীর ছবি। বইটির নাম **নারী**, লেখক- হুমায়ুন আজাদ। প্রচ্ছদে লেখা ছিলো *সাড়ে ৪ বছর নিষিদ্ধ থাকার পর প্রকাশিত*। এরকম একটি তথ্য জানার পর সেই বই না পড়ে উপায় নেই! বন্ধুর কাছে ধার করে লুকিয়ে লুকিয়ে বইটি পড়ে ফেললাম। এ বই আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত করলো! লিঙ্গের রাজনীতি নিয়ে আমি প্রথমবার স্পষ্ট করে কিছু জানলাম। মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট সম্পর্কে জানলাম, নারীর শরীর সম্পর্কে জানলাম, বাস্তব অভিজ্ঞতা হবার বহু আগেই জানলাম যৌন তৃপ্তির ক্ষেত্রে

ক্লিটোরিসের গুরুত্ব! এই বই পড়ার পরপরই পড়লাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **নিষিদ্ধ বই, নিষিদ্ধ** লেখা সবকিছুই আমাকে তখন চুম্বকের মতো টানছে। সেই বইতে আমি পেলাম আরো অনেক বইয়ের রেফারেন্স, যেগুলো যৌনতার কারণে নিষিদ্ধ হয়েছিলো। এভাবেই পড়া ***লেডি চ্যাটারলি'জ লাভার*** এবং এরকম আরো কিছু গল্প উপন্যাস। **নারী** বইটি লেখার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে হুমায়ুন আজাদের কাছে কৃতজ্ঞ!

কলেজ লাইফ চুটিয়ে পড়েছি হুমায়ূন আহমেদের মিষ্টি প্রেমের গল্প। আমার *সিরিয়াস সাহিত্য করা* বন্ধুরা এতে বিরক্ত হতো, তাদের মতে ওগুলো *লঘু সাহিত্য*! কিন্তু আমি আজীবন সকল কথা, সকল বক্তব্য, সকল উপদেশ ক্রসচেক করে নিয়েছি, আর চেষ্টা করেছি নিজের বুদ্ধিতে চলতে। তো ওই সময়ে একদিকে নচিকেতা বলছে ভালোবাসা একটা *পিটুইটারির খেলা*, অন্যদিকে হুমায়ূন আহমেদ শেখাচ্ছেন টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ আর জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য। এই প্রেম-স্বপ্ন-মাতাল সময়ে হাতে এলো সিমোন দ্য বোভোয়ার রচিত **দি সেকেন্ড সেক্স** এর বাংলা অনুবাদ **দ্বিতীয় লিঙ্গ**, হুমায়ুন আজাদেরই অনুবাদে। অনেক পরে জেনেছি ওটা সংক্ষেপিত অনুবাদ, তাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। সার্ত্র আর বোভোয়ার সম্পর্কে জেনে ভীষণ অভিভূত হলাম। পুরোনো ডায়েরী ঘেঁটে দেখি সেখানে জয় গোস্বামীর নকল করে আমার কল্পনার মানস প্রেমিকার উদ্দেশ্যে লিখছি - *পাগলী, তোমার সঙ্গে অস্তিত্ববাদী জীবন কাটাবো/ পাগলী, তোমার সঙ্গে সার্ত্র-বোভোয়ার কাটাবো জীবন!*

•

একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ঘটলো। বিষয় হিসেবে বেছে নিলাম সমাজের মূল কাঠামো, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা নিয়ে যা কাজ করে, অর্থনীতি! এতদিন মার্কস এঙ্গেলসের আশপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করেছি, এবার হলো সচেতনভাবে মার্কসবাদী সাহিত্য পাঠ। ধ্যানধারণায় মৌলিক পরিবর্তন এনে দিলো এঙ্গেলসের **পরিবার, ব্যক্তিমালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি**। কীভাবে প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে পিতৃতন্ত্রের সূচনা হলো, নির্বিচার যৌনাচার থেকে পুনালুয়া পরিবার, তারপর ক্রমে গোত্রগত পরিবার - জোড়বাঁধা পরিবার এবং ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টির সাথে কীভাবে পরিবারের ধরন পাল্টে এক পতি-পত্নী

পরিবারে রূপ নিলো, এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা হলো এই বইটি পড়ে। ছোটবেলায় পড়া দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের **সে যুগে মায়েরা বড়** যে এই বইয়েরই *শিশু সংস্করণ* তা বুঝতে বাকি রইলোনা।

নারীবাদ বিষয়ক বেশ কিছু রচনার একটি চমৎকার সংকলন বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত **নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে**। এখানে শরৎচন্দ্র থেকে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, বেগম রোকেয়া থেকে ক্লারা জেটকিন, অগাস্ট বেবেল, এমা গোল্ডম্যান, সিমন দ্য বোভোয়ার প্রমুখের লেখা আছে। এর বেশ কিছু লেখা মার্কিন নারীবাদী লেখিকা মিরিয়াম ইশক্লিয়ার সম্পাদিত **ফেমিনিজিম** সংকলন থেকে নিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে। সমাজতন্ত্রই কি নারীর মুক্তি দিতে পারে, বা কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়েই নারী মুক্তি ঘটবে কিনা এই নিয়ে বেশ মতবিরোধ রয়েছে। 'অনেকের' মতে, আলাদা করে নারী মুক্তি আন্দোলনের কোনো প্রয়োজন নেই, সমাজতন্ত্র এলেই নারীর মুক্তি স্বয়ংক্রিয় ভাবে ঘটে যাবে! এই বিষয়ে ভূমিকাতেই বদরুদ্দীন উমর লিখছেন -

এদেশে যারা প্রগতিশীল, বিপ্লবী, কমিউনিস্ট ইত্যাদি বলে নিজেদের পরিচয় দেন নারীদের মধ্যে তাঁদের বাস্তবত কোন সাংগঠনিক অথবা প্রচার কাজও নেই। এ বিষয়ে যথাযথ কোন চিন্তাভাবনার সাক্ষ্য তাঁদের মধ্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নারী সংগঠনের এবং নারী বিষয়ক চিন্তাকে মনে করেন নিষ্প্রয়োজন, কারণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে শ্রেণী সংগ্রামে নিযুক্ত হলেই নাকি নারী সমস্যা যা কিছু সেটার সমাধান এমনিতেই হবে! তার জন্য বিশেষ সংগঠন অথবা আন্দোলনগত কোন কাজের প্রয়োজনই নেই!

এসব চিন্তাভাবনার সাথে যে শ্রেণী সংগ্রাম অথবা নারী মুক্তি আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই এবং এই চিন্তাভাবনার বশবর্তী লোকদের দ্বারা যে শ্রেণী সংগ্রাম অথবা কোন প্রকার নারীমুক্তি আন্দোলন সম্ভব নয় সেটা বলাই বাহুল্য।

এই সংকলনেই আমি প্রথম পড়ি ভার্জিনিয়া উলফের **আ রুম অফ ওয়ান'স ওউন** এর অনুবাদ **নিজের একটি কামরা**। এই হৃদয়স্পর্শী লেখাটিতে আমরা দেখতে পাই পুঁজিবাদের যুগে বেঁচে থাকার দায়! পুঁজি যখন ঈশ্বর, আমাদের অনবরত অর্থের চিন্তাতেই জীবন কাটাতে হয় -

আমার খালা, মেরি বেটন, মারা গিয়েছিলেন বম্বে শহরে। উকিলের এক চিঠি আমার বাক্সে পড়ল এবং আমি খুলে দেখি খালা আমাকে আজীবন বার্ষিক পাঁচশত পাউন্ডের আয় দান করে গিয়েছেন। আমার এই উত্তরাধিকারের সংবাদ যে রাতে আমি পেলাম সে দিনই নারীদের ভোটাধিকার প্রদান সংক্রান্ত আইন পাশ হয়। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, ভোটাধিকার এবং অর্থ - এই দুটোর মধ্যে টাকাটাই আমার কাছে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল।

ভার্জিনিয়া উলফ লিখছেন -

আমি ভাবছিলাম, একটি নির্দিষ্ট আয় থাকলে মানসিকতার কী অবাক করা পরিবর্তনই না ঘটে। পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমার পাঁচশত পাউন্ড কেড়ে নিতে পারবেনা। চিরদিনের মতো আমার খাদ্য, বাসস্থান আর পোশাকের চিন্তা নেই। কোনো পুরুষের মন রক্ষা করে আমায় কথা বলতে হবেনা, আমাকে দেয়ার তার কিছুই নেই। এ কারণে অচেতনভাবে মানব জাতির অপর অর্ধাংশের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে থাকলো।

জেন্ডার বিষয়ে পড়া আমার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বই হলো আনু মুহাম্মদের লেখা **নারী পুরুষ ও সমাজ**। এই বইয়ের মতো পরিণত বই আমি খুব কম পড়েছি। এখানে নারীবাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, মধ্যযুগে নারীর অবস্থা, নারীর অধিকার আদায়ে ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লবের ভূমিকা, নারীমুক্তি ও মার্কসবাদ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে নারীর অবস্থা, বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলন, পতিতাবৃত্তি বিষয়ে রাষ্ট্রের দ্বিচারিতা - এই সমস্ত বিষয় নিয়ে খুব সুচিন্তিত বিশ্লেষণ রয়েছে। পুরুষতন্ত্রে দীক্ষিত নারীও নারীমুক্তির জন্য ক্ষতিকর। এই শ্রেণীর নারীর মনস্তত্ত্বের চমৎকার বিশ্লেষণ আছে এই বইতে -

পুরুষের অধস্তন হয়ে থাকায় অভ্যস্ত নারীকে গৃহপালিত পশুর মতই স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে হয় না, খাওয়া পরা বর্তমান ভবিষ্যৎ বাইরের জগতের ঝড়ঝাপটা সবকিছুর জন্য এই নারী পুরুষের উপর নির্ভরশীল। পুরুষ যদি তা যোগান দিতে পারে তাহলে তার মধ্যে ডুবে থাকতে অনেক মধ্য-উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীই পছন্দ করে। এই নারী স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে উন্নীত ভাবে, স্বামীর পয়সা, মর্যাদা নিয়ে গর্বিত থাকে, এর বদলে স্বামীকে শরীর-ভালবাসা-সন্তান দিয়ে কৃতার্থ থাকে। তাঁদের সবসময়ের মনোযোগ থাকে স্বামীকে আগলে রাখা, কেননা এই মহার্ঘ্য-সম্বল গেলে তাঁদের আর কিছুই থাকে না।

এই গৃহবধূদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য দাঁড়ায় স্বামী সন্তানদের সেবা দিয়ে সন্তুষ্ট করা। তাদের আর কোন পরিচয় নেই। অনেক উচ্চ শিক্ষিত মেয়েও এই জীবনেই সার্থকতা খোঁজেন। এই বদ্ধজীবনে এই গৃহবধূদের জীবনবোধও সীমাবদ্ধ জগতকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। শাড়ি, বৈষয়িক স্বচ্ছলতা, প্রসাধনী এবং স্বামীর মনোযোগ ঘিরে তাদের অধিকাংশের সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি, রাগ, ক্ষোভ, অভিমান আবর্তিত হয়।

এছাড়াও, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান নিয়েও দারুণ বিশ্লেষণ রয়েছে এই বইতে।

•

আমাদের দেশে হরহামেশাই যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এর মাঝে কোনো কোনোটা আলোচনার জন্ম দেয় ও বিপুল মনোযোগ পায়। ঘটনার পক্ষে বিপক্ষে, অপরাধী - ভিক্টিমের পক্ষে বিপক্ষে অনেকে অবস্থান নেয়। এরকম ঘটনাগুলো আমাদের আশেপাশের মানুষদের আসল চেহারা উন্মোচিত করে দেয়। তারপর আবার নতুন ইস্যু আসে, আগের ঘটনা ধামাচাপা পড়ে যায়। ১৯৯৮ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ জোরালো একটি আন্দোলন হয়েছিলো - ধর্ষণবিরোধী ছাত্রী আন্দোলন। সেই আন্দোলনের পূর্বাপর ঘটনা নিয়ে একটা সংকলন রয়েছে। সেই সংকলনটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। **অপরাধীর কোনো দল নেই** বলে আমরা অনেক সময় অপরাধের সাথে ক্ষমতার সম্পর্ককে আড়াল করে ফেলি। কিন্তু অপরাধ, বিশেষত ধর্ষণ বা যৌন সহিংসতার মতো অপরাধের সাথে ক্ষমতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এই সংকলনটিতে আমরা দেখতে পাই, ধর্ষক যখন ক্ষমতাসীন দলের হয় তখন কীভাবে প্রশাসন তাকে বাঁচাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে!

•

বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার একটা পাঠচক্রে আমরা নবনীতা দেবসেনের লেখা পাঠ করছিলাম। আমি নবনীতার লেখায় নারীর ব্যক্তিজীবনের সংগ্রাম কীভাবে এসেছে সেটি নিয়ে কথা বলছিলাম। পাঠচক্র শেষে যখন ফিরে আসছি, পিছন থেকে একজন ডাকলো। ফিরে দেখি, আমার ডিপার্টমেন্টের এক জুনিয়র

মেয়ে। আমার কাছে এসে বললো, আমাকে ওই কথাটা আরেকবার বলুন, আমি লিখে নেই। আমি তাকে পুরো লেখাটাই দিলাম। সে একটা বাক্যের দিকে আমার দৃষ্টি ফেরালো - *পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বেশীরভাগ মেয়েই তাদের মায়েদের অসম্পূর্ণ জীবনযাপন নিজেদের জীবনে পূর্ণ করার স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে ওঠে। এই একটা জায়গায় পৃথিবীর সব মেয়েদের রয়েছে দারুণ মিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এই একটা লাইনের মধ্যে আমার পুরো জীবনের গল্পটা বলা হয়েছে!*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা ছেলেমেয়েদের মধ্যে উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েই বেশী। মধ্যবিত্ত জীবনে সৎ উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হবার একমাত্র চাবিকাঠি হলো পড়াশোনা। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সংগ্রামটা আরো বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষে উঠতে না উঠতেই তাদের বাড়ি থেকে বিয়ের চাপ আসতে থাকে। সেই চাপ, আরো নানাবিধ সামাজিক চাপ সামলে সংগ্রাম করতে হয় একটা ডিগ্রীর জন্য, একটা স্বাবলম্বী, স্বাধীন জীবনের জন্য। আমার জুনিয়র এই মেয়েটির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নবনীতার এই লেখাটিতে সে তার নিজের জীবনের ছবিই দেখতে পেয়েছে!

•

একটু সচেতনভাবে লক্ষ্য করলে দেখবো আমাদের ভাষাও কী ভীষণ রকম পক্ষপাতদুষ্ট! অধিকাংশ গালিই যৌন সম্বন্ধীয় এবং নারীর প্রতি আক্রমণাত্মক। ভাষাকে বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারি আমাদের সভ্যতার ইতিহাস আসলে পুরুষতন্ত্রেরই ইতিহাস। আমরা নারী যৌনকর্মীকে পতিতা বলি, কিন্তু তার খদ্দেরকে পতিত বলিনা। পুরুষতান্ত্রিক ভাষা নারীকে কখনো দেবী বলে মাথায় তুলেছে আবার দাসী বানিয়ে পায়ের কাছেও রেখেছে। **অবগুণ্ঠিতা, অবলা, পতিব্রতা, অঙ্গনা, কামিনী, পদ্মিনী** প্রভৃতি শব্দ যেমন নারীর নম্র-ভদ্র রূপকে প্রকাশ করে; অপরদিকে **ললনা, দ্বিরুঢ়া, দ্বিচারিণী, স্বৈরিণী, কুলটা, ছিনাল, নাগিনী, ডাকিনী, বনিতা** - এই শব্দগুলো দিয়ে নারীর একটি নেতিবাচক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। ভাষার প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে একবার এক ক্লাসমেট জুটির মাঝে ঝগড়া লাগলো। অতি কুৎসিত সেই ঝগড়া। ঝগড়ার এক পর্যায়ে ছেলেটি মেয়েটিকে বললো, তুই *একটা বেশ্যা!*

মেয়েটির মুখ রাগে ক্ষোভে লাল হয়ে উঠলো। সে কোনো উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য ভাষা হাতড়াতে লাগলো। নিরুপায় হয়ে বললো, *তুইও একটা বেশ্যা!* এই শুনে ছেলেটি হেসে ফেললো। ছেলেকে বেশ্যা বললে সেটা কোনো অর্থ বহন করেনা (যদিও বর্তমানে পুরুষ যৌনকর্মীর প্রচলন হয়েছে), অন্তত সেটি তার মনে কোনো রেখাপাত করে না। ভাষারও যে লিঙ্গ আছে, এটি আমার সেদিন প্রথম মনে হয়েছিলো!

কিন্তু এর বিপরীতে নারীর কি কোনো প্রতিরোধ নেই? তাও আছে। ভাষাতেই তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। বলা হয় **যে বল এ পারেনা, সে ছল এ করে**। নারীকে শেখানো হয়, তার যৌনতা, তার সৌন্দর্যই তার পুঁজি। এটা দিয়েই সে পুরুষকে *বেঁধে রাখবে*। সমস্ত রোমান্টিক সাহিত্য এই বিষয়টার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। নারীর কাছে থাকবে ভালোবাসার খনি, পুরুষ তার পৌরুষ দিয়ে সমস্ত বিশ্বজগত উদ্ধার করে নারীর কাছে ছুটে আসবে, নারী তাকে আশ্রয় দেবে। নারী হবে কুহকিনী, মায়াবিনী। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা উপন্যাসের নায়ক অমিত রায়কে আমরা বলতে শুনি -

শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে, ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা। প্রকৃতি শয়তানী তার জোগান দেয়।

প্রায় একইরকম কথা আমরা পাই মৈমনসিং গীতিকায় -

আখখেতে ছাগল বন্দী, জালে বন্দী মাছ
নারীর কাছে পুরুষ বন্দী, ঘোরায় বারোমাস।

মৈমনসিং গীতিকার এই গান আর রবীন্দ্রনাথের *রূপে তোমায় ভোলাবোনা, ভালোবাসায় ভোলাবো* এর মাঝে ভাষার পার্থক্য থাকলেও ভাবের পার্থক্য নেই! সাহিত্য দিয়ে সমাজের বিশ্লেষণ করা যায়। আমরা বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যে চোখ বুলালে দেখবো নারীর এই একই চিত্র আঁকা হয়েছে। মেঘনাদবধ কাব্যে আমরা দেখি মেঘনাদ যখন যুদ্ধে যাবে তখন তাঁর স্ত্রী প্রমীলা তাকে বাধা দিচ্ছে। এই সময় মেঘনাদ তাকে বলছে -

হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি, তোমার কল্যাণে,
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"

কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর বহুল আলোচিত **নারী** কবিতায় বলেছেন -

রাজা করিতেছে রাজ্য-শাসন,
রাজারে শাসিছে রাণী
রাণীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে
রাজ্যের যত গ্লানি।

এই তালিকা আরো দীর্ঘ করা যায়, তবে এখানে সেটি প্রয়োজন হবেনা। এই ব্যাপারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাসিম আখতার হুসেইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা রয়েছে **Sources of Female Autonomy** শিরোনামে। এছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুস্মিতা চক্রবর্তীর লেখা **লোকঐতিহ্যে পিতৃতন্ত্র ও নারীর স্বতন্ত্র স্বর** বইটাও এই ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণা। সুস্মিতা তাঁর এই বইটিতে সাতটি অধ্যায়ে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানকে জেন্ডারের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। ভাষা ও সাহিত্যে নারীর স্বতন্ত্র স্বর, লোকখাদ্য এমনকি লোকপেশায় নারীর জীবিকা, লোককাহিনীতে পুরুষতান্ত্রিক উপাদান, লোকনাট্যের বিশ্লেষণ, মাজারের নারীর লোকধর্মীয় সংস্কৃতি এবং লোক প্রবাদের বিশ্লেষণ রয়েছে এই বইতে।

•

তসলিমা নাসরিন! বাংলাদেশে নারীবাদের কথা বললে এই নামটি অবশ্যই উচ্চারণ করতে হবে, নানা বিতর্ক, সমালোচনা ও দ্বন্দ্বের কথা মাথায় রেখেই।

তাঁর বর্তমান লেখাপত্রে প্রবল দায়িত্বজ্ঞানহীনতা থাকলেও, বাংলাদেশে নারীবাদী আন্দোলনে তসলিমার একটা বড় ভূমিকা আছে। তসলিমাই প্রথম বাংলাদেশে ব্যক্তি-নারীর জীবনের দুঃখ কষ্ট আনন্দ বেদনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে সামনে এনেছেন। রোকেয়া যেখানে সামষ্টিকভাবে সমাজকে আক্রমণ করেছেন সেখানে তসলিমা আক্রমণ করেছেন ব্যক্তি ও গোষ্ঠিকে। রোকেয়া যদি হন ধ্রুপদী যুগের নারীবাদী তবে তসলিমাকে আমরা বলতে পারি আধুনিক যুগের নারীবাদী। সময়ের সাথে সাথে বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য পাল্টায়। নারীবাদ বিষয়টা Contextual - অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা! এই লড়াইয়ে কখনো গৌণ দ্বন্দ্ব প্রধান হয়ে যায়, কখনো প্রধান দ্বন্দ্ব গৌণ। ইরানে যখন নারীদেরকে হিজাব পরতে বাধ্য করা হচ্ছিলো, তখন ইরানের নারীরা হিজাব পুড়িয়ে এর প্রতিবাদ করেছিলো। ঠিক একই সময়ে ভারতের একটি স্কুলে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা মেয়েদের হিজাব পরতে বাধা দিচ্ছিলো। সেখানে মেয়েরা হিজাব পরে তার প্রতিবাদ করেছিলো। এই দুই লড়াই আসলে একই - নিজের পোশাকের ব্যাপারে নিজের স্বাধীনতার জন্য লড়াই!

এই ব্যক্তিস্বাধীনতার জায়গাতেই তসলিমার অবদান। সমাজে, পরিবারে নিজেদের আপনজনদের দ্বারা নির্যাতনের কথা লিখে, ধর্মীয় উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে কলম ধরে তসলিমা আক্রমণের শিকার হয়েছেন সমাজে অবশিষ্ট বিভিন্ন সামন্তীয় শক্তির। তাঁর ফাঁসি দাবি করে এই দেশে মিছিল হয়েছে, সর্বোপরি তাকে দেশছাড়া করা হয়েছে। তবু তসলিমা এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে দ্বিধা করেননি। প্রেমের ব্যাপারেও তসলিমা ছিলেন দ্ব্যর্থহীন-

যে কোনো দূরত্বে গেলে তুমি হও যার তার খেলুড়ে পুরুষ
যার তার পুরুষকে আমি আমার বলিনা!

তসলিমার এই অহংকারটুকু আমার ভালো লাগে। বাংলাদেশের বহু নারী এই অহংকারটুকু দেখাতে পারেন না আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে। শুধু আর্থিক সঙ্গতি নেই বলে তারা বছরের পর বছর **সংসার** নামের একটা শুকনো কাঠামো আঁকড়ে থাকে। আমি চাই একদিন বাংলাদেশের সকল নারীর এই কথাটা বলার মতো আর্থিক সক্ষমতা তৈরী হোক।

•

সময়ের বুকে একফোঁটা টলটলে অশ্রুবিন্দুর মতো একটা বই ওরিয়ানা ফাল্লাচির লেখা **লেটার টু এ চাইল্ড নেভার বর্ন**। এর একটি সংক্ষেপিত ভাবানুবাদ করেছেন আনু মুহাম্মদ - **হাত বাড়িয়ে দাও**। এই বইতে লেখিকা তাঁর গর্ভের সন্তানের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখছে, এই চিঠির মধ্যে দিয়ে উঠে আসছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যেমন, **নতুন সন্তান কি জন্ম দেয়া উচিত? ভালোবাসা আসলে কী? স্বাধীনতার মাত্রা কতটুকু?**

আমি এখনও বুঝি না ভালোবাসা কী? এখন মনে হয় এটি একটি বড় ধরনের তামাশা যা মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে, অশান্ত পৃথিবীতে তাকে শান্ত রাখার জন্যে উদ্ভাবিত হয়েছে। সর্বত্র শুনি ভালোবাসার কথা- ধর্ম, বিজ্ঞাপন, সাহিত্য, রাজনীতি কোথাও বাদ নেই। প্রত্যেকেই সব দুঃখের সর্বরোগহর ওষুধ হিসেবে ভালোবাসাকে দাঁড় করিয়ে আসলে মানুষের দেহ এবং আত্মা উভয়ের সঙ্গেই প্রতারণা করছে।

যেই মিথ্যা স্বাধীনতার ধারণায় আমরা বাস করি, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ওরিয়ানা ফাল্লাচি। তাঁর গর্ভের অনাগত সন্তানের উদ্দেশ্যে বলছেন -

***স্বাধীনতা** সম্পর্কে বহু কথা তুমি শুনবে। **ভালোবাসার** মতোই বহুল ব্যবহৃত এবং বহুল প্রতারিত একটি শব্দ। এমন মানুষের সঙ্গে তোমার দেখা হবে যারা 'স্বাধীনতা'র জন্যে কঠোর আত্মত্যাগ করছে, অত্যাচারিত হচ্ছে এমনকি মৃত্যু বরণ করছে। আমি চাই তুমি তাদের মতোই একজন হও। তুমিও দেখবে এর জন্যে তোমাকেও অত্যাচার সইতে হবে। দেখবে **স্বাধীনতা**-র অস্তিত্ব নেই- এটি একটি স্বপ্ন যা তোমার এখনকার অস্তিত্বের মধ্যে অতি সংগোপনে জন্ম নিচ্ছে। এই পৃথিবীর চাইতে এখন তোমার স্বাধীনতা অনেক বেশি। তুমি এখন জানো না দাসত্ব কী- বাইরে এলে তাও তোমাকে বুঝতে হবে- মর্মে মর্মে। বাইরে তোমার অসংখ্য প্রভু থাকবে যারা সবকিছুই তোমার উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করবে।*

যে এক পতি-পত্নী পরিবার কাঠামো দেখে আমরা অভ্যস্ত, সেই পরিবার নিয়ে লেখিকার মন্তব্য -

পরিবারে আমার কোনো আস্থা নেই। এগুলো মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য নানাপ্রকার আজেবাজে আইন-কানুন দিয়ে মানুষকে বশ করবার জন্যে বানানো হয়েছে। পরিবার হচ্ছে একটা শিশুকে একই নামের অধীনে একই ছাদের নিচে আটকে রাখা। পছন্দ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তারা একসঙ্গে থাকতে বাধ্য হয়।

ওরিয়ানা ফাল্লাচি পেশায় ছিলেন একজন সাংবাদিক। নিজের পেশাগত জায়গাতেও তাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। বিশ্বের বিখ্যাত রাজনীতিবিদদের সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রকাশিত তাঁর বই বেশ আলোচিত। পুঁজিবাদের যে এলিয়েনেশনের মধ্যে আমরা বাস করি, তার কথাও এখানে খুব সহজ করে বলেছেন তাঁর অনাগত সন্তানের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে -

খাওয়ার জন্য তোমার টাকা লাগবে, ঘুমোবার জন্যে টাকা লাগবে, একজোড়া জুতোর জন্য টাকা লাগবে আর টাকার জন্যে কাজ করতে হবে। তারা কাজ সম্পর্কে অনেক কিছু বলবে- বলবে শ্রমের আনন্দের কথা, শ্রমের মর্যাদার কথা। ওদের এসব কোনো কথা বিশ্বাস করবেনা। ওরা নিজেদের পৃথিবী সুন্দর করার জন্য এসব ইচ্ছাকৃতভাবে বানিয়ে বলে। তোমাকে এখানে যে-কাজ করতে হবে তা অন্যের জন্যে। নিজের আনন্দের জন্য তুমি কখনোই কাজ করতে পারবে না- তোমার ইচ্ছামতোও করতে পারবে না তুমি।

সম্ভবত অনেক আগে জীবন এমন ছিল না। সেখানে শ্রম ছিল আনন্দের।

এই বইটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছেন নুসরৎ নওরিন। বাতিঘর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সেই অনুবাদটিও অনবদ্য। সেই বইয়ের শেষের দিকে যখন লেখিকার অনাগত সন্তান গর্ভেই মারা যান তখন তিনি লিখছেন -

জীবন একটা মৃত্যুদন্ড। বুঝিনা, শুধু শূন্যতাতে ফিরে যাওয়ার জন্যই কেন আমাকে শূন্যতা থেকে উৎসারিত হতে হবে।

জীবন ঘষে স্ফুলিঙ্গ বের হওয়া এরকম আরো দুটি বই হলো চিমামান্দা এনগোজি আদিচির লেখা **We should all be feminist** ও **A feminist manifesto in fifteen suggestions.** দুটি বইই বেশ সহজ ইংরেজীতে লেখা এবং একে নারীবাদের ইশতেহারও বলা যায়। ইশতেহারের মতোই এই বইদুটো ছড়িয়ে যাওয়া উচিত হাত থেকে হাতে। এ বই দুটো সব দেশের সব বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক শাখায় পাঠ্য হওয়া উচিত। এই বইয়ের বাঙলা অনুবাদ করেছেন শিমিন মুশশারাত। এই বই থেকে আলাদা করে কোনো বাক্য উদ্ধৃতি দেয়া কঠিন, কারণ এর প্রতিটা বাক্যই গুরুত্বপূর্ণ। এই বইতে আদিচি বলছেন-

আমরা যদি কোনো কিছু বারবার করি, তখন সেটাকে স্বাভাবিক মনে হয়। আমরা যদি কিছু বারবার দেখি, তাহলে সেটাকেই স্বাভাবিক মনে হয়। যদি শুধু ছেলেদের ক্লাস মনিটর বানানো হতে থাকে, তাহলে একটা সময় আমরা সবাই অবচেতন মনে ভাবতে শুরু করি যে ক্লাস মনিটরকে ছেলেই হতে হবে। যদি আমরা শুধু পুরুষদের প্রতিষ্ঠানপ্রধান হিসেবে দেখতে থাকি, একসময় শুধু পুরুষেরা প্রতিষ্ঠানপ্রধান হবেন, এটাই আমাদের কাছে 'স্বাভাবিক' মনে হবে।

বিয়ে নামক যে প্রতিষ্ঠানটি আমাদের সমাজে একটি বিরাট জায়গা নিয়ে আছে সেটির প্রসঙ্গে আদিচির মন্তব্য -

বিয়ে একটা ভালো ব্যাপার হতে পারে। আনন্দ, ভালোবাসা আর পারস্পরিক সহযোগিতার আধার হতে পারে। কিন্তু আমরা কেন মেয়েদেরই বিয়ে নিয়ে আরাধনা করতে শেখাই, ছেলেদের কেন তেমনটি শেখাই না? ... বৈবাহিক ভাষা প্রায়ই মালিকানার ভাষা, সাহচর্যের ভাষা নয়।

অনেকেই বলে, নারী অধিকারের কথা আলাদা করে বলার কিছু নেই, সকলের সমানাধিকারের কথা বললেই তো হয়।

এই বইতে আমরা স্পষ্ট জবাব পাই -

নারীবাদ অবশ্যই মানবাধিকারের একটা অংশ। কিন্তু মানবাধিকারের মতো অস্পষ্ট একটা শব্দ ব্যবহার করলে লিঙ্গের যে নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র অসংগতি রয়েছে সেটাকে অস্বীকার করা হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী নারীদের যে

মানবাধিকারের বাইরে রাখা হয়েছে, সেটা অস্বীকার করার একটা উপায় এটা। এটা করলে অস্বীকার করা হয় যে নারীরা লিঙ্গবৈষম্যের শিকার। সমস্যাটা মানুষ হওয়া নিয়ে নয় বরং নির্দিষ্টভাবে নারী হওয়া নিয়ে। শতাব্দী ধরে পৃথিবী মানুষকে দুটি দলে ভাগ করে রেখেছে এবং একটি দলকে ক্রমাগত শোষণ ও বঞ্চিত করেছে। এই সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে এই শোষণ ও বঞ্চনার বিষয়টিকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

ঠিক যেমন আমাদের দেশে পাবলিক প্লেসে কোনো মেয়ে সিগারেট খেলে তখন হঠাৎ করে সবার মনে পড়ে যায় সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর! এখানে সমস্যাটা শুধু সিগারেট খাওয়া নয়, একজন নারীর সিগারেট খাওয়া!

•

পুরুষতন্ত্র ক্ষতিকর, কিন্তু কার জন্য? সে কি শুধু নারীর জন্য? না, পুরুষের জন্যও -

পুরুষত্ব একটি কঠোর, ছোট্ট খাঁচা আর আমরা আমাদের ছেলেদের সেই খাঁচায় পুরে দিই। আমরা ছেলেদের দুর্বলতা আর স্পর্শকাতরতাকে ভয় পেতে এবং তাদের সত্যিকারের সত্তাকে অবগুণ্ঠিত করতে শেখাই।

পুরুষতন্ত্র শুধু নারীর জীবনকেই দুর্বিষহ করে তোলে না, তা পুরুষের ওপরও চাপিয়ে দেয় একরাশ প্রত্যাশার বোঝা। পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা চেতনায় স্ত্রীও সম্পদের আরেকটি রূপ মাত্র, তাই আর সব সম্পদের মতো এটিকেও 'রক্ষার' জন্য অর্থনৈতিক শর্ত পূরণ করতে হয়। *ভাত দিবার পারস না, ভাতার হবার চাস?* এর মত প্রবাদ এরকম দৃষ্টিকোণ থেকেই উদ্ভূত। এক্ষেত্রে, সমস্ত অর্থনৈতিক দায় পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। **ভালো সাংসারিক পুরুষরা** পরিণত হয় এক ভারবাহী প্রাণীতে। উৎপলকুমার বসুর কবিতায় আমরা পাই এরকম দায়িত্ব-ক্লান্ত পুরুষের ছবি -

বন্ধু, তোমার হাতের উপর হাত রাখলেই আমি টের পাই বাজারে তোমার অনেক দেনা, ছেলেটা উচ্ছন্নে গেছে, মেয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে, আজ যা বলার আছে তুমি আমাকেই বলো, স্ত্রীর মুখরতার কথা বলো, সহকর্মীদের

শঠতার কথা বলো, রাতে ঘুম হয় না সেই কথা বলো, আর যদি কাঁদতেই হয় তবে এই কাঁধে মাথা রেখে কাঁদো, বন্ধু।

•

তাহলে কেমন হবে আমাদের ভবিষ্যত পৃথিবীতে নারী পুরুষের সম্পর্ক? সমাজ বিকাশের ধারায় আমরা সামন্তবাদ দেখেছি, এখন পুঁজিবাদ দেখছি। ভবিষ্যতে কি আসবে নতুন কোনো সমাজব্যবস্থা? সেটা কি সমাজতন্ত্র? সমাজতন্ত্র কি মুক্তি দিতে পারবে এই লৈঙ্গিক বিভাজন থেকে? নাকি সেখানেও শ্রমিকশ্রেণীর নামে আধিপত্য করবে পুরুষতন্ত্র? সমাজতন্ত্রে পরিবারের ধরন কেমন হবে? সেটা কি বেরিয়ে আসবে এক পতি-পত্নী কাঠামো থেকে?

এ বিষয়ে অসাধারণ একটি বক্তৃতা আছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নেত্রী আলেক্সান্দ্রা কোলন্তাই এর। পার্টি মিটিংয়ে কমরেডদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই লেখাটি তিনি তৈরী করেন। এর ইংরেজী শিরোনাম Make Way for Winged Eros, তাসলিমা আখতার এর বাংলা করেছেন **ভালোবাসার পথ কর দাও**। এই লেখায় কোলন্তাই বলছেন, *যখন মানুষের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি পরিবর্তিত হয় ভালোবাসাও তখন রূপান্তরিত হয়।*

সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি যখন পরিবর্তিত হয়, ভালোবাসার ধরনও তখন পাল্টে যায়। তাই সামন্তীয় সমাজে যেখানে বিয়ের 'শর্ত' হিসেবে ভালোবাসা কোনো আবশ্যিক বিষয় ছিলো না, পুঁজিবাদে সেটিই বিশেষ প্রাধান্য পেলো।

কোলন্তাই এর লেখায় -

যে সামন্ত অধিরাজ তার হৃদয় থেকে প্রেয়সীর প্রতীক মুছে ফেলেনি, প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করেছে, প্রেয়সীর হাসি জয় করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে পেরেছে, সে ই এক সেকেন্ডও চিন্তা না করে কোনো শহুরে মেয়েকে ধর্ষণ করতে অথবা তার ভৃত্যকে নির্দেশ দিয়ে কোনো সুন্দরী কৃষাণীকে তার আনন্দের জন্য তুলে আনতে পারতো।

সামন্ত মতাদর্শ বিবাহ থেকে ভালোবাসাকে আলাদা করেছিলো: আর বুর্জোয়ারা এ দুটোকে যুক্ত করেছে। বুর্জোয়ারা ভালোবাসা এবং বিবাহকে অবিচ্ছেদ্য বিষয়ে পরিণত করেছে।

সামন্তবাদের অধীনে যেখানে পারস্পরিক আকর্ষণের প্রশ্নটি কখনোই উঠতো না, বুর্জোয়া নৈতিকতা সেখানে চায় যে, পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে বিবাহ হলেও সঙ্গীদের ভালোবাসার ভান করতে হবে, এমনকি তা কপটতার চর্চা হলেও।

সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা আর এক পতি-পত্নী পরিবার, এই দুটোই বুর্জোয়া সমাজের আবশ্যিক বিষয়। সম্পদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার জন্যই তার এক পতি-পত্নী পরিবার প্রয়োজন -

বুর্জোয়া নৈতিকতা ভালোবাসার একজন মানুষকে ঘিরেই সবকিছু চায়!... বুর্জোয়ারা একগামী বিবাহভূক্ত ভালোবাসাকে তাদের আদর্শ হিসাবে বেছে নিয়েছে।... বিবাহ বহির্ভূত ভালোবাসাকে অনৈতিক কাজ হিসেবেই দেখা হয়। এসব ধারণা অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শর্ত এবং অবৈধ সন্তানদের মধ্যে সম্পদ বন্টন প্রতিরোধের ইচ্ছে দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পুঁজির পুঞ্জীভবনের দিকেই সমগ্র বুর্জোয়া নৈতিকতা পরিচালিত হয়।

তাহলে কেমন হবে সেই কাঙ্ক্ষিত সমাজ, যেখানে অবসান ঘটবে সমস্ত লিঙ্গগত বৈষম্যের? সেই সমাজের একটি চিত্রও কোলন্তাই আমাদের সামনে হাজির করেছেন -

সেই সমাজে থাকবে নারী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে সমতা, পুরুষতান্ত্রিক অহংকার এবং নারীর ব্যক্তিত্বের দাসসুলভ নিগ্রহের অবসান ঘটবে। অন্যের অধিকারের প্রতি পারস্পরিক স্বীকৃতি থাকবে, অর্থাৎ একজন আরেকজনের হৃদয় এবং সত্তার ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী হবেনা, যেটা বুর্জোয়া সমাজে আমরা দেখে থাকি কারণ এখানে পরিবারের সাথে সম্পত্তির ধারণা যুক্ত।

নারীপুরুষের সম্পর্কের মাঝে থাকবে বন্ধুত্বসুলভ সংবেদনশীলতা, ভালোবাসার মানুষদের অন্তর্জগতকে চেনা ও বোঝার ক্ষমতা (বুর্জোয়া সমাজ এই গুণাবলিগুলো কেবল নারীদের কাছেই দাবি করে)। অন্যব্যক্তির

অধিকারের প্রতি সম্মান বৃদ্ধি পাবে, পারস্পরিক সংবেদনশীলতা আত্মস্থ হবে; নারী পুরুষরা তাদের ভালোবাসার প্রকাশের জন্যে কেবল চুমু বা আলিঙ্গনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং দুজন যৌথ সৃজনশীলতা ও কর্মতৎপরতায় সচেষ্ট হবে, ভালোবাসার প্রকাশ ঘটবে যৌথ নির্মাণের মধ্য দিয়ে।

যতদিন না এরকম একটি উদার সমাজ আমরা গড়ে তুলতে পারছি, ততদিন সমাজে থাকবে নারী পুরুষ বৈষম্য আর এর বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে পতিতাবৃত্তি, যৌন সহিংসতা,খুন,ধর্ষণ, পর্ণ ইন্ডাস্ট্রিসহ আরো অনেক কুৎসিত বিষয়।

পুনশ্চ:

এই পুরো আলোচনাটিকে ভীষণ কেতাবি বলে মনে হতে পারে। মনে হতেই পারে আমি নারীবাদ বিষয়টিকে শুধু বইয়ের পাতাতেই দেখেছি। হয়তো তাই হতো, হয়তো নারীবাদ বলতে আমি শুধু নারীবাদী সাহিত্যকেই বুঝতাম, যদি না আমার কাজরীর সঙ্গে পরিচয় হতো!

কাজরীর সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটা আমার এখনো মনে পড়ে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেট দিয়ে ঢুকছি, এমন সময় ওর সাথে দেখা। কিছুদিন হলো আমি একটা ট্রিপ শেষ করে এসেছি। নানা কথার পর ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার ট্রিপ কেমন হলো? আমি বিস্তারিত বর্ণনা দিলাম। তারপর বললাম, ওই জায়গাটা অনেক নিরাপদ, ওখানে গেলে তোমার অনেক সেফ মনে হবে। কাজরী খুব স্বাভাবিকভাবে বললো, *সেটা আমাকে গিয়ে বুঝতে হবে, আপনার চোখ দিয়ে দেখে তো আমি বুঝবনা। বিকজ, স্টিল ইউ হ্যাভ মেল প্রিভিলেজ!*

আমি চমকে উঠলাম! এমনভাবে, এরকম একটা অকাট্য যুক্তিতে যে আমার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় তা আমি চিন্তাও করিনি! আমি বাসায় এলাম, আমার মাথায় ঘুরতে থাকলো কাজরীর কথাটি।

এরপর কাজরীর সাথে বন্ধুত্ব আরো গভীর হয়, একসাথে অনেকটা সময় কাটানো হয়। কাজরী আমার দেখা একজন আপাদমস্তক নারীবাদী। সবকিছুকে প্রশ্ন করে যাওয়া, বিনা প্রশ্নে কোনো কিছু মেনে না নেয়ার এক অসাধারণ গুণ আছে ওর। আমি অনেক **নারীবাদী** দেখেছি যারা ব্যক্তিজীবনে অসম্ভব স্বার্থপর

ও শ্রেণীসচেতন। কাজরী ব্যতিক্রম, ওর যে বিষয়টি আমাকে মুগ্ধ করে তা হলো, সকল শ্রেণীর নারীর জন্য সমান মমত্ববোধ। সেই প্রথম দিনের মতোই মুগ্ধতা নিয়ে দেখেছি কাজরী প্রশ্ন করে গেছে পরিপার্শ্বের সকল পুরুষতান্ত্রিক উপাদানকে।

জীবন নিয়ে কাজরীর অনেক স্বপ্ন, ওর ইউরোপে যাওয়ার ইচ্ছা। আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে বেদনার্ত হয়ে আমি একদিন কথায় কথায় ওকে বললাম, *না গেলে হয় না? কাজরী করুণ মুখে বললো, আমি তো এখনো আমার নিজের জীবনটা বাঁচাই শুরু করিনি! এই দেশে তা সম্ভবও না!*

কাজরী এখন কোথায় আছে আমি জানিনা। বিনয় মজুমদারের মতো বলতে ইচ্ছা করে - আমার সঙ্গে কয়েক মাসের আলাপ, তারপর কোথায় যে চলে গেলো, আর খোঁজ রাখিনি!

আরো কোটি কোটি মেয়ের মতো একটা মুক্ত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে এই বিরাট পৃথিবীর কোথাও সে নিশ্চয়ই ভালো আছে, জারি রেখেছে তার লড়াই - নিরন্তর প্রশ্ন করে যাওয়া, ক্ষমতাকে প্রশ্ন করে যাওয়া, কাঠামোকে প্রশ্ন করে যাওয়ার লড়াই...

স্টিল ইউ হ্যাভ মেল প্রিভিলেজ! কাজরীর বলা প্রথম দিনের কথাটি এখনো আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়। প্রতিধ্বনিত হতেই থাকবে, যতদিন না পৃথিবীটা সবার জন্য সমান হবে!